ভিয়েতনাম— আগে জানা, পরে দেখা

উৎপল সিংহ

ষাটের দশকের শেষ দিকে যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হই, তখন ওখানকার রাজনৈতিক আলোড়ন যেমন খুব প্রাসঙ্গিক ছিল, তেমনি তখনকার ছাত্র সমাজ দারুণভাবে অনুসরণ করত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভিয়েতনামের সংগ্রামের প্রেক্ষাপট, কেননা সেটা ছিল অসম এক সংঘাত যেখানে প্রবল ক্ষমতার অধিকারী আমেরিকা ওরকম একটা ছোট্ট দেশের ওপর কর্তৃত্ব জাহির করার জন্য এক নিষ্ঠুর যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। কিছু সিনেমা, কিছু স্থিরচিত্র, কিছু লেখা— এ সবের মধ্য দিয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠত টোকা মাথায় দিয়ে ভিয়েতনামের কৃষক, সাধারণ মানুষ সামান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বিধ্বংসী আমেরিকান বোমা বর্ষণের মোকাবিলা করে যাচ্ছে এক অদম্য, প্রত্যয়ী মানসিকতা নিয়ে। তারপরে তো জীবনের গতিপথ নানাভাবে এগিয়ে গিয়েছে। ভিয়েতনামেও বিরাট পরিবর্তন হয়েছে, হো চি মিনের সংগ্রামী দিন পেরিয়ে আমেরিকার ফিরে আসা এবং আরও কত কিছুর মাধ্যমে। তবু সেই পুরোনো স্মৃতি প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে আবার ফিরে এল, বিশেষ করে যখন সারা পৃথিবী ঘোরার এক নেশা আমাকে পেয়ে বসেছিল আমার কর্মোত্তর জীবনে। অতএব ২০১৮-র ফেব্রুয়ারি মাসে আমাদের দুজনের বেড়ানোর মানচিত্রে লেখা ছিল— 'চলো ভিয়েতনাম'— সেই পুরোনো 'অজেয় ভিয়েতনাম'।

দক্ষিণ চীন সাগরের বুকে লম্বাটে এই দেশে প্রায় দশ কোটি লোকের বাস। খ্রিস্টের জন্মের একশো বছর আগে থেকে প্রায় হাজার বছর ধরে এই দেশ চীন সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। ছোটো ছোটো উপজাতি যেমন ভিয়েত, তে, তাই, খেমার, নিজেদের মধ্যে বিবাদে জড়িয়ে থাকত বলে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন সহজেই পথ খুঁজে পেত। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সেই ধারাবাহিকতায় চলে আসে ফরাসিরা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হো চি মিন শুরু করেন তাঁর সংগ্রাম— কিন্তু ফলশ্রুতি হয় ভিয়েতনাম বিভাজন— উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম। ঠিক যেমন আমাদের দেশে ভারত-পাকিস্তান তৈরি হয় তেমনি ব্রিটিশ প্রতিরোধ প্রায় ২৫ বছর ধরে চলার পর ১৯৭৬ সালে আমেরিকার বিদায় আর ভিয়েতনামের আবার সংযুক্তিকরণ। এই বিচিত্র বিদেশি আগ্রাসন ভিয়েতনামীদের এক অননুকরণীয় মানসিকতা তৈরি করেছিল যা পৃথিবীর সব প্রান্তের অত্যাচারিতদের কাছে একটা মাইল ফলক। অথচ ২০০০ সালে সেই ভিয়েতনামই উদার অর্থনীতির হাত ধরে আবার প্রথম বিশ্বের অর্থনীতির স্পর্শে সজীব হতে চেষ্টা করেছে— সরকার কমিউনিজম্

কেন্দ্রিক হওয়া সত্ত্বেও। এই পটভূমি, এখনকার পরিপ্রেক্ষিত—সব মিলিয়ে ভিয়েতনামে বেড়াতে যাওয়া একটা প্রিজমের মধ্য দিয়ে অনেক বর্ণের সমাহার দেখার চেষ্টা করা।

ফেব্রুয়ারি ২০১৮-র শেষ সপ্তাহে ব্যাংকক হয়ে ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয়ে নামলুম ওদের সকাল এগারোটায়— আমাদের থেকে দেড় ঘণ্টা এগিয়ে। তবে এয়ারপোর্টে ভিসার ব্যাপার মেটানোর পর মুদ্রা বিনিময় করতে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ কেননা ১

আমেরিকান ডলার = ২০,০০০ ডং (ভিয়েতনামী মুদ্রা)। সে একেবারে কাগজের নোটের পাহাড়। প্রথমেই মিউজিয়াম অফ এথনোলজি দেখতে গিয়ে একটা ছোট্ট চিকেন স্যান্ডউইচের দাম পড়ল ২,৪৫,০০০ ডং। অর্থাৎ কার্ড ব্যবহার না করলে ভিয়েতনাম ঘোরার ন-দিন যে এই অদ্ভুত মুদ্রা ব্যবহার চলবে এটা বোঝা গেল। মিউজিয়ামে ও দেশের বিভিন্ন উপজাতির (যার মধ্যে ভিয়েত প্রায় শতকরা ৯২), ইতিহাস, জীবনযাত্রা আর্থসামাজিক বিবর্তন-এর সাক্ষী হওয়া গেল। কিন্তু বাইরে ঝিরঝিরে বৃষ্টি, প্রায় ১৪°C তাপমান একটু তো জড়সড় করে রাখছিল। তবে নতুন জায়গায় নতুন জিনিস দেখার আনন্দ বৃষ্টি বা ঠান্ডা আটকাতে পারে না।

বিকেলে ঘোরার অভিজ্ঞতা আরও মনে থেকে যাবে। ঠিক এদেশের প্যাডল্ রিকশার মতো রিকশায় চড়ে হ্যানয় শহরের আনাচে-কানাচে

ঘুরলুম। দোকান-পাট, মানুষজন, দু-পাশের বাড়ি দেখতে দেখতে কলকাতার হাতিবাগান অঞ্চলে রিকশায় ঘোরার মতো। খালি মানুষজনের অবয়ব মোঙ্গলয়েড— এইটুকু তফাৎ। রিকশায় নামাল একটা সুন্দর স্কোয়ারে লেকের ধারে— নাম হোয়ান কিয়েম (ওদের পৌরাণিক কথনে রিটার্ন অফ সোর্ড)। পাশেই ফুলের বাগিচায় ভরা পার্ক আর অরগো সন টেম্পল্ বা জেড বুদ্ধ মন্দির। তার সঙ্গে লাগোয়া টেম্পল অফ লিটারেচার। সবগুলোর মধ্যে ওদের এক অংশের বৌদ্ধ ধর্ম প্রীতি, পুরোনো ঐতিহ্য মিলেমিশে একটা দৃষ্টিনন্দন ব্যাপার তৈরি হয়েছিল।

শেষ বিকেলে ফুটপাথের ধারে কাটা আনারস খাওয়া, পরে চা-এ চুমুক— একেবারে কলকাতার অনুষঙ্গ। অত ব্যস্ত স্কোয়ারে অজস্র মানুষের ব্যস্ত চলাচল উপভোগ করে সন্ধ্যাবেলায় গেলুম লোটাস হলে ওয়াটার পাপেট-এর অনুষ্ঠান দেখতে। এক ঘণ্টা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে ওদের জীবজন্তুকে কেন্দ্র করে চমৎকার ওয়াটার ব্যালে দেখা। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পৌরাণিক কাহিনি ভিত্তিক গন্ডার দিয়ে অত্যাচারীর পেট এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেওয়া বা হাতির মিলন— প্রত্যেকেরই অনুষঙ্গ আলাদা। ওই সবের রেশ কাটিয়ে রাত্তিরের খাওয়া একেবারে ভারতীয়। রেস্তোরাঁ-র নাম 'নমস্তে হ্যানয়'। মালিক কানাডাবাসী দক্ষিণ ভারতীয়। তিনি অনেকটা সময় হ্যানয় কাটান। তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতা এই নৈশ ভোজের একটা আকর্ষণ ছিল।

তারপরের দিন সাত সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে প্রায় ১৬০ কিমি দূরে ক্রুইজ স্টেশনে গেলুম হ্যালংবে যাওয়ার জন্য। ভিনাশিন্ হারবার থেকে ক্রুইজে ওঠা— নামও চমৎকার হুয়োং হাই জাঙ্কস্। এই হ্যালংবে দক্ষিণ চীন সাগরের সঙ্গে যুক্ত। উনিশশো উনসত্তরটি দ্বীপ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে প্রায় ১৫০০ স্কোয়ার কিমি-এর এই বে-তে। তার অতি সামান্য কয়েকটাতেই মানুষজনের বাস। মাছের খোঁজে আড়াইশো জন ধীবর এখানকার একটা দ্বীপে ১৯৫০ সালে মূল ভূখণ্ড থেকে এসেছিল— মূল উদ্দেশ্য জীবিকা নির্বাহ। চমৎকার ক্রুইজে (পরিসরে ছোটো হলেও) আমরা চারজন আর এক ফরাসি দম্পতি প্রথম রাত কাটালুম। আলস্য, ব্যবস্থাপনা, খাওয়া-দাওয়ার আরাম আর আদিগন্ত নীলের আবহে ছোটো ছোটো দ্বীপকে উপভোগ করা। শামুক, অক্টোপাস, স্কুইড— কিই না খাওয়া হল।

অবশ্য আমার গিন্নির তো এ সব খাবারে সম্পূর্ণ অনীহা। তার মধ্যে ওখানকার স্থানীয় খাওয়ায় নুন, তেল প্রায় অনুপস্থিত। অতএব দৃশ্য উপভোগ বেশি, পাকস্থলীর উপভোগ সর্বভুক না হলে কম। ছোটো ছোটো বাঁশের নৌকোয় একটা সাদা বালির সৈকতে সময়

কাটালুম। সকালের আর এক আকর্ষণ ছিল ওই বিরাট জলাশয়ের এক অংশে ওই ২৫০ ধীবর পরিবারের বাসস্থান, মাছ ধরার জায়গা ফিশারম্যান কোভ ঘোরা। জলের ওপর ভাসমান বাড়ি, মাছ ধরার সরঞ্জাম। আমাদের দেখে ছোটোদের হাত নাড়া। আর আমাদের জলযানের ওই উপসাগরের বুকে ক্ষণে ক্ষণে গজিয়ে ওঠা ছোটো ছোটো পাহাড়কে কাটিয়ে যাওয়ার মজা, এক জায়গায় তো দুটো পাহাড় ওপরে জোড়া লাগা, আমরা তার ছোট্ট ফাঁক দিয়ে পার হয়ে একটা ফ্লোটিং ভিলেজ থেকে আর একটাতে চলে গেলুম। 'একই অঙ্গে কত রূপ দেখিনি তো আগে।' মূল ভূখণ্ডেও এই অবিমিশ্র আনন্দ ভ্রমণের রেশ রয়েই গেল।

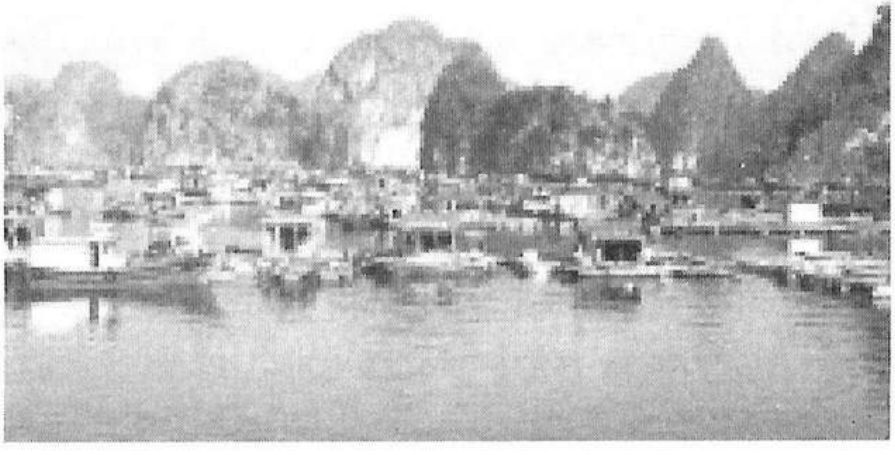

তারপরে রাতে সেই ফরাসি দম্পতি চলে যাওয়ায় পরে সঙ্গী হল এক কানাডিয়ান দম্পতি। তাঁরা অনেক বেশি মিশুকে, তাই আরও জমাটি আড্ডা। পরের দিন সকালে সেই মানুষের ঠেলা-টানা নৌকোয় গেলুম থাই কেভ-এ যেখানে স্ট্যালাগটাইট আর স্ট্যালাগমাইটের সমাহার। ঠিক এখানকার আরাকুর কাছে বোরা কেভের মতো। তাই বিভিন্ন দ্বীপে ঘোরার শেষে মনে হল হ্যালং বে-র 'একই অঙ্গে এত রূপ'। ভালো

জিনিসেরও শেষ হতে হয়। দুই রাত্রি, তিন দিন ওই বে-র ওপর কাটিয়ে আবার হ্যানয় ফেরা।

পরের দিন সকালে ঝিরঝিরে বৃষ্টি— কিন্তু আমাদের ঘোরার সূচি তো আর পালটানো যায় না। ব্রেকফাস্ট সেরে চলে গেলুম শহরের সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ হো চি মিন স্মৃতিসৌধ দেখতে। অনেকটা আমাদের ইন্ডিয়া গেটের আশেপাশের মতো বহিরঙ্গ। কেয়ারি করা গাছ, পার্ক— আর তার মধ্যেই আধুনিক ভিয়েতনামের জনকের স্মৃতিসৌধ। সামনে দাঁড়িয়ে মনে হয় একটা মানুষের ডাকে গরিব কৃষক, মজদুর, সাধারণ মানুষ জীবন বিপন্ন করে বছরে পর বছর লড়ে গিয়েছে অতীব শক্তিশালী আমেরিকার বিরুদ্ধে। টোকা মাথায় দিয়ে চাষের খেত রক্তাক্ত করেও চাষিরা লড়ছে— এ ছবি ভিয়েতনাম সংগ্রামের এক স্মৃতিস্মারক। আমেরিকা তখন একদিকে চাঁদে লোক পাঠাচ্ছে আর এক দিকে এই অবর্ণনীয় অত্যাচার। বিধ্বংসী নাপাম্ বোমা বর্ষণে হেপাটাতে ছারখার করে দেওয়ার চেষ্টা স্রেফ কমিউনিজম উৎখাতের নামে, কেননা তার কিছু দিন আগে কিউবাতে ব্যর্থ হয়েছিল সেই চেষ্টা। কিন্তু এই সৌধের সামনে দাঁড়িয়ে অগণিত দেশি-বিদেশি দেখে মনে হয়নি সবাই কমিউনিস্ট হয়ে সেখানে হাজির হয়েছেন। সত্যজিৎ রায়ের 'প্রতিদ্বন্দ্বী' সিনেমায় ইন্টারভিউ বোর্ডে সিদ্ধার্থর সেই কথা যে 'ভিয়েতনাম সংগ্রামকে শ্রদ্ধা করলেই কমিউনিস্ট হতে হয় না। এটা একটা আলাদা অনুভূতি যেখানে অত্যাচারিত অত্যাচারীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় নিজেদের অস্তিত্বের রক্ষায়। আর তাই এই সংগ্রাম সদা প্রণম্য।' আর ওই অসংখ্য দর্শনার্থীর কাছে তার মূল কাণ্ডারি হো চি মিন তো বটেই। আগের ক-দিনে বেড়ানোর পরে এ আর এক অনুভূতি। স্কোয়ারের একদিকে ভিয়েতনাম পার্লামেন্ট। চারপাশ ঘুরে ছবি তুলে আবার এয়ারপোর্টের পথে পরের গন্তব্যস্থল হুয়ে যাব বলে। কিন্তু তার আগে আশেপাশে মিউজিয়াম, সিঙ্গল্ পিলার প্যাগোডা-তে যা দেখার দেখে হ্যালং বে আর হ্যানয়ের স্মৃতি মাথায় রেখে চারদিনের পুরোনো উত্তর ভিয়েতনাম পেছনে ফেলে রাখলুম। এবার যাত্রা মধ্য ভিয়েতনামের পথে হুয়ে আর হুই আন-এর জন্য।

হ্যানয় থেকে এক ঘণ্টার উড়ান। উনিশ শতক থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত হুয়ে ছিল পুরোনো নগুয়েন রাজবংশের রাজধানী। পরে তা হ্যানয়ে চলে যায়। এখানকার

মূল বাসিন্দারা ঠিক ভিয়েত উপজাতি নয়। অন্য কিছু উপজাতির মিশ্রণ যা সেই চৈনিক প্রভাবের যুগ থেকে ধীরে ধীরে এক মিশ্র উপজাতির রূপ পেয়েছে। এখানকার রাজবাড়ি যাকে 'রয়্যাল সিটাডেল্ আর ফরবিডেন্ সিটাডেল' বলা হয়। সেটাই দেখার মতো, যদিও ভগ্নপ্রায় তাও দক্ষিণ দরজা এখনও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। শেষ রাজা খাই দিনের সমাধি দেখে আমরা গেলুম পারফিউম নদীর ঠিক তীরে থিয়েন মু প্যাগোডা দেখতে। তার সিঁড়ি ভাঙা হাঁটু সমস্যার মানুষদের কাছে এক চ্যালেঞ্জ, তবে উঠে গেলে সেই প্যাগোডা আর সেখান থেকে নদীর প্যানোরামিক ভিউ অসাধারণ। ওরকম পরিষ্কার জল আমাদের দেশের নদীগুলোতে হয় না কেন! হুয়ে শহর একটা শান্ত জনপদ ওই স্বচ্ছ সলিলা নদীর পাড়ে যার সমস্ত সৌধের মধ্যে রয়েছে স্থানীয় ও পশ্চিমা স্থাপত্যের এক নয়নাভিরাম মিশেল। কিন্তু সেই জায়গা ছেড়ে এবার চললুম ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ শহর হুইআনের পথে। অসাধারণ নৈসর্গিক দৃশ্যে ভরা রাস্তা। একধারে পাহাড়, নীচে সমুদ্র (ভিয়েতনাম বে), পথে পার হলুম দানাং শহর, ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় যা মারাত্মক কুখ্যাতি পেয়েছিল আমেরিকান এয়ারবেস হিসেবে। যেখান থেকে এরোপ্লেন বিধ্বংসী নাপাম বোম, গ্যাসীয় মারণাস্ত্র ছড়িয়ে দিত দেশটার আনাচে কানাচে সংগ্রামী জাতিটাকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য। অথচ প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে সেই শহর এখন আধুনিক ভিয়েতনামের ব্যাবসাবাণিজ্য চালানোর এক অন্যতম বন্দর শহর।

দানাং পার হয়ে হুই-আন ঢোকা, ছোট্ট প্রাচীন শহর। পরতে পরতে ইতিহাস, ছোটো ছোটো গলি, ইটে বাঁধানো রাস্তা, দোকান, ইতিহাসকে সাক্ষী করে এখনও দাঁড়িয়ে থাকা জাপানি ব্রিজ। তারই ফাঁকে নদীতে ঘোরা, নদীর ওপারে গিয়ে পটারিজ-এর কারুকলা দেখা। এই ঘোরাঘুরির ফাঁকে নির্বিবাদী সাধারণ মানুষদের দেখা। ভাষা অন্তরায়। তাই কথা কম। কিন্তু দেখে বিশ্বাস করতে মন চায় না এরা প্রায় পঁচিশ বছর ধরে এক অসম সংগ্রাম চালিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে জায়গা করে নিতে পেরেছিল। শহরের আকর্ষণ ছিল চাইনিজদের কন্‌ফুশিয়াস মন্দির আর এক বিখ্যাত এশিয়ান ফ্যামিলির বাড়ি যেখানে ওনারা বংশ পরম্পরায় রয়েছে, যদিও অতি বৃষ্টিতে বাড়ি জলের তলায় চলে যায়। জল নেমে গেলে ওনারা আবার তার সংস্কার করে বাস করতে থাকেন। অদ্ভুত এক ঐতিহ্যের চাবিকাঠি বহন করে চলেছেন। আমরা যখন যাই তখন একতলা জলে ভাসছে— ওই সময়ে কিছুদিন এক নাগাড়ে বৃষ্টি হওয়ায় আর পাশের নদীর জল ঢুকে যাওয়ায়। পুরোনো দিনে এই নদী কেন্দ্রিক শহর ছিল ব্যস্ত বন্দর যেখানে পা পড়েছে চাইনিজ, জাপানিজ, ভারতীয়, পর্তুগীজ সবাইয়েরই ব্যাবসার খাতিরে। ১৯৯০ সালে আর্কিওলজিকাল খোঁড়াখুঁড়ির পর প্রায় তিন হাজার বছরের পুরোনো সভ্যতার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। তার নিদর্শন রয়েছে পাশের মিউজিয়ামে। এক দারুণ ইতিহাসের হাতছানি। ভ্রমণার্থীরা ভিয়েতনাম বলতে খালি হ্যানয়, হ্যালংবে আর হো চি মিন সিটি (সায়গন)

বোঝে, কিন্তু মধ্য ভিয়েতনামের এই দুটো শহর না ঘুরলে ভিয়েতনামের ঐতিহ্যকে চেনা যাবে না।

আবার আকাশ পথে চললাম ভিয়েতনামের সবচেয়ে বড়ো শহর হো চি মিন সিটিতে। পুরোনো দিনের এই সায়গন শহরে তখনকার আমেরিকান তাঁবেদার সরকারের রাজধানী ছিল। সেই সময়কার প্রেসিডেন্টের ৫৪ হেক্টর জুড়ে রাজপ্রাসাদ এখন রি-ইউনিফিকেশন

প্যালেস। যা-র অনেকটা অংশই মিউজিয়াম, ঘুরে ঘুরে পুরোনো ভিয়েতনাম, সংঘর্ষের ভিয়েতনাম, সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত ভিন্ন সময়ের ধারায়— এ সবই ওই মিউজিয়াম ঘোরার সুবাদে দেখা— দেখতেও দৃশ্যসুখ ওই বিশাল প্রাসাদের প্রেক্ষাপটে। হো চি মিনের সংগ্রামের শেষ দিকে পূর্বতন দক্ষিণ ভিয়েতনামী প্রেসিডেন্ট আমেরিকানও বোস্টন শহরে নিয়ে যায়। ওনার স্ত্রী নব্বই ঊর্ধ্ব, এখনও বেঁচে আছেন আর তাঁকে স্বামীর মৃত্যুর পর ফিরিয়ে এনে ওই প্রাসাদেই রাখা হয়েছে।

ওই প্রাসাদ দেখে চলে গেলুম অ্যাম্পেরার অফ জেড প্যাগোডা দেখতে। সেদিন কী একটা পরব ছিল। মনে হচ্ছিল যেন আমাদের কালীঘাট মন্দির। তার মধ্যেই সামলিয়ে ভেতরে ঢুকে বুদ্ধ দর্শন। এর পরের গন্তব্য ছিল প্যারিসের ধাঁচে নোতরদাম গির্জা। ভিয়েতনাম যেহেতু বহুদিন ফ্রেঞ্চ কলোনি ছিল তাই এই গির্জাটি শহরের কেন্দ্রস্থলে জায়গা পেয়েছে। পাশেই আমাদের জিপিও-র ধাঁচে সেন্ট্রাল পোস্ট অফিস।

সব মিলিয়ে এই ১৫ মিলিয়ন মানুষ বাস করা শহর সদা জমজমাট। আমাদের হোটেলটা ছিল আরও জমজমাট জায়গায় যেখানে নৈশ জীবনের উদ্দামতাও লক্ষ করা গেল। তথাকথিত কমিউনিস্ট জমানায় অর্থনীতির দরজা খুললে আমেরিকান প্রভাব ঢুকবে

না— এটা বাতুলতা। পিউরিটানরা হয়তো অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন। তবে ভিয়েতনামের অন্য জায়গায় এটা চোখে পড়েনি।

পরের দিন ব্রেকফাস্ট সেরেই প্রায় ৬০ কিমি দূরে ওদের পটভূমিতে পৌরাণিক শহর মাই থো-তে গেলুম। সেখানকার পুরোনো প্যাগোডা আর নতুন অতি বৃহৎ লাফিং বুদ্ধ-র মূর্তি দেখে হতবাক। ভাইজাগের উপকণ্ঠে পাহাড়ের ওপর শিবমূর্তির চেয়েও বড়ো।

এরপরের বেড়ানোর পর্ব এক কথায় ছিল অসাধারণ। মেকং ডেলটা ক্রুইজ। ব-দ্বীপ বেড়ানোর ক্ষেত্রে সুন্দরবন আর ভিতর কণিকার অভিজ্ঞতা আগেই ছিল। তবে মেকং এখানে সাগর সমান চওড়া, হাওয়ায় উত্তাল। আমাদের মোটর বোট মোচার খোলার মতো ঢেউয়ের মাথায় দুলছিল। সেই তুলনায় আগের দুটো ব-দ্বীপ সংলগ্ন নদী একেবারেই শান্ত। এই ভ্রমণ প্রায় আট ঘণ্টা ধরে উপভোগ করেছি যার মধ্যে কিছুক্ষণ একটা গ্রামে নেমে সময় কাটানো হয়েছিল। ওখানকার মানুষদের দৈনন্দিন জীবন, কুটীর শিল্প, হাতের কাজ— এ সবের সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় অনেকটা মাটির কাছাকাছি আবহ তৈরি হয়েছিল। তবে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দাঁড় টানা সাম্পানে ব-দ্বীপের খাঁড়ি ঘোরা— মাঝে মাঝে মাথায় টোকা চড়িয়ে। এটাই বাঁচোয়া ওই ব-দ্বীপের জঙ্গলে সচরাচর হিংস্র জন্তুর দেখা মেলে না। সারাদিনটা এই অনাস্বাদিত ঘোরের মধ্যে কাটিয়ে আবার হো চি মিন সিটির হোটেলে সন্ধেবেলা ফেরত।

ভিয়েতনামে কাটানো ন-দিনের শেষ দিন রাখা ছিল আবার সেই ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় থেকে প্রায় ফোকলোর হয়ে যাওয়া ভিয়েতকং গেরিলাদের আস্তানায় যাওয়া একেবারে সায়গন নদীর ধারে জঙ্গলের মধ্যে। পরের দিন সকালে প্রায় ৬০ কিমি গাড়ি চলার পর পৌঁছোলুম কুচি টানেল ফরেস্ট-এর প্রান্তে।

সায়গন নদীর ধারে ঘন-জঙ্গল, ভিয়েতকং গেরিলারা এই জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে অসম যুদ্ধ চালিয়েছিল নিজেদের মতো সব কিছু বানিয়ে। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তিন থাক বাঙ্কার। তিন মিটার, পাঁচ মিটার আর আট-দশ মিটার গভীরতায়। একদম শেষেরটায় থাকা মাঝখানটায় খাওয়া-দাওয়া আর প্রথমটা থেকে শত্রুপক্ষ পর্যবেক্ষণ। ওদের ছোটো ছোটো চেহারা, অফুরন্ত মনের জোর, পরিশ্রমী সংগ্রামের তাগিদ ওদের দিনের পর দিন এই অঞ্চলে যুদ্ধ করতে সাহায্য করেছিল। আমার

এই চেহারায় তিন মিটার গভীরে দাঁড়াতে গিয়েই দফারফা। তার মধ্যে গিন্নির সশব্দ প্রতিবাদ আর না ঢোকার জন্য। তবে এখানে ওদের সবচেয়ে বড়ো হাতিয়ার ছিল বুবি ট্র্যাপ। আমেরিকানদের নাপাম বোমা ওই জঙ্গল বার বার পুড়িয়েছে, রুট মার্চ করে ওই সব বাঙ্কার গোলাগুলি চালিয়ে ধ্বংস করেছে, তাও রোখা যায়নি। এই প্রতিরোধে ওদের সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র ছিল 'বুবি ট্র্যাপ'। আমেরিকানদের গোলাগুলি থেকে কার্টিজ পেয়ে, বা জঙ্গলের বাঁশ কেটে তীক্ষ্ণ ফলা বানিয়ে এই ট্র্যাপ তৈরি করে ওই বাঙ্কারের প্রথম ধাপে সাজিয়ে রাখত। তারপরে ওপরটা লেভেল করে ঘাসের স্তর বিছিয়ে হয়ে যেত জঙ্গলের মাটি। এই পদ্ধতিতে কত আমেরিকান সৈনিক ওই ফলাবিদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। নিজের চোখে এই সব দেখে সেই আগুন ঝরানো দিনগুলোর কথা আপনা থেকেই সিনেমা, বইয়ের পাতা ছাড়িয়ে চোখে ভেসে ওঠে। মনে হয় বাঙ্কারের তলায় টানেল কাটা রাস্তা দিয়ে পার হয়ে সায়গন নদীতে গেরিলারা ডুব সাঁতার দিয়ে পার হওয়ার চেষ্টা করছে। আমেরিকার অহমিকায় একটার পরে একটা আঘাত আর নিক্সন ম্যাকনামারার ওয়াশিংটনে বিনিদ্র রাত— কেন না তখন বার্কলে, শিকাগো, বোস্টনেও প্রতিবাদে আছড়িয়ে পড়ছে আর্মস্ট্রং-অল্‌ড্রিনের চাঁদে যাওয়ার গর্বকে ছাপিয়ে।

পুরো ভিয়েতনাম-টা শুধু তাই বেড়ানো নয়। এ এক অন্য মানসিকতায় তীর্থ দর্শন। পরের দিন মক্ বাই রোড বর্ডার পেরিয়ে যখন ভিয়েতনাম ছেড়ে কাম্বোডিয়ার পথে চললুম। তখন একটি বার তো পেছন ফিরে তাকিয়ে মনে মনে বলতেই হয়েছে— 'অজেয় ভিয়েতনাম। ভিয়েতনামের সাধারণ মানুষের এই উদ্দীপিত অস্তিত্ব সদা প্রণম্য।'